বাংলার মুসলিম জাগরণে জামাল উদ্দীন আফগানীর প্রভাব (পর্ব-১)

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

সঞ্চারণ
ঐতিহ্যের অনুরণন

বাংলার মুসলিম জাগরণ ও আফগানীঃ

বিপুল মুসলিম জন অধ্যুষিত বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ১৭৫৭ সালে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পদানত হয়। এরপর থেকে ভারতবর্ষে বিস্তীর্ণ এলাকা ক্রমশ ইংরেজরা গ্রাস করেছিল। তার মুকাবিলায় মীর কাসেম ও টিপু সুলতান সহ কয়েকজন আঞ্চলিক শাসকের নেতৃত্বে প্রতিরোধ সংগ্রাম পরিচালিত হয়। এসব আঞ্চলিক প্রতিরোধকে সমর্থন দানের মতো কোন কেন্দ্রীয় শক্তি বা নেতৃত্ব তখন দিল্লীতে কিংবা মুসলিম বিশ্বে ছিল না। ফলে এসব প্রতিরোধ ক্ষণস্থায়ী হয়।

জন বিদ্রোহ ও প্রতিরোধ সংগ্রামঃ

এ সময় জনতার কাতার থেকে উত্থিত হচ্ছিল একের পর এক বিদ্রোহ। বাংলা-বিহার অঞ্চলে ফকির মজনু শাহ্ থেকে শুরু করে অসংখ্য আঞ্চলিক মুসলিম নেতা পরিচালনা করেন জন-বিদ্রোহ। ১৭৬৩ সাল থেকে শুরু হয়ে এই গণসংগ্রাম চলাকালেই শাহ্ ওয়ালি উল্লাহর (১৭০৩-১৭৬১) উত্তরসূরী শাহ্ আবদুল আযীয দেহলভী (১৭৪৬-১৮২৩) ইংরেজ কবলিত হিন্দুস্তানকে ১৮০৩ সালে □দারুল হরব□ বা যুদ্ধ কবলিত এলাকা ঘোষণা করেন। তাঁর এই ঐতিহাসিক ফতোয়া ভারত বর্ষের মুসলমানদের ছোট-বড় আঞ্চলিক প্রতিরোধ সংগ্রামগুলিকে একটি অভিন্ন আদর্শিক লক্ষ্যে সংহত ও সমন্বিত করতে শক্তি যোগায়। এই পটভূমিতে ১৮১৮ সালে হাজী শরিয়ত উল্লাহর (১৭৮১-১৮৩৯) নেতৃত্বে প্রধানত পূর্ব বাংলা ভিত্তিক ফরায়েজী আন্দোলন এবং একই বছর সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর (১৭৮৬-১৮৩১) নেতৃত্বে দিল্লি থেকে জিহাদ আন্দোলনের সূচনা হয়। ১৮২০-১৮২১ সাল থেকে বাংলায় জিহাদ আন্দোলনের কাজ শুরু হয়। এই আন্দোলনগুলি ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিরোধ ও মুক্তি সংগ্রামকে সুনির্দিষ্ট আদর্শিক লক্ষ্যে পরিচালিত করে। জিহাদ আন্দোলনে পূর্ব বাংলাসহ বাংলার মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য অংশীদারিত্ব ছিল।

১৮৩১ সালের মে মাসে জিহাদ আন্দোলনের প্রধান নায়ক সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী শাহাদত বরণ করেন। একই বছর এ আন্দোলনের আঞ্চলিক নেতা মাওলানা সৈয়দ নিসার আলী তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১) নারকেলবাড়িয়ার প্রতিরোধ যুদ্ধে শহীদ হন। ১৮৩৯ সালে (আফগানীর জন্মের বছর) ফরায়েজী আন্দোলনের নেতা হাজী শরীয়ত উল্লাহ ইনতেকাল করেন। জিহাদ আন্দোলন ও ফরায়েজী আন্দোলনে এ সময় নতুন নেতৃত্বের উদ্ভব হয়। এই নেতৃত্বের প্রেরণায় এবং এই আন্দোলনের কর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই ১৮৫৭ সালের ভারতবর্ষে ইংরেজ বিরোধী সিপাহী বিপ্লব সংঘটিত হয়। সিপাহী বিপ্লবের (১৮৫৭) ব্যর্থতার ফলে উপমহাদেশে মুগল সাম্রাজ্য অস্তিত্ব হারায়।

বর্ণহিন্দু রেনেসাঁ:

সিপাহী বিপ্লবের পটভূমিতে ইংরেজ ও বর্ণহিন্দুদের মিলিত শোষণ, লুণ্ঠন ও হামলার শিকার বাংলার মুসলমানগণ ছিলেন সবদিক থেকেই পর্যুদস্ত। ১৮১৭ সালে রাম মোহন রায়ের (১৭৭২-১৮৩৩) কোলকাতা আগমনের সময় থেকে ১৮৭১ সালের মধ্যে কোলকাতাকে ঘিরে ইংরেজ প্রসাদপুষ্ঠ লুটেরা নব্যধনিক গোষ্ঠীর মধ্যে নব জাগরণের জোয়ার সৃষ্টি হয়। এই রেনেসাঁর চেতনায় মুসলমানদের কোন ঠাঁই ছিল না। ১৮১৮ সাল থেকে শুরু করে ওই সময় পর্যন্ত প্রকাশিত হিন্দু মালিকানাধীন সংবাদপত্রগুলি

হিন্দুধর্মের গৌরব প্রকাশ করতো। ১৮৬০-৭০ সালে ঢাকাকে কেন্দ্র করে সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে "পূর্ববঙ্গের প্রবলশ্রেণী সংলগ্ন" বুদ্ধিজীবীদের মাঝেও জাগরণের ঢেউ লক্ষ্য করা যায়।

> ১৮১৮ থেকে ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত ৭১টি বাংলা সাময়িকপত্রের সাথে যুক্ত ছিলেন রাম মোহন রায় থেকে শিবনাথ শাস্ত্রী পর্যন্ত তৎকালীন বাংলার বিখ্যাত বুদ্ধিজীবীরা, ধর্মীয় পরিচয়ে যাঁদের প্রায় সকলেই ছিলেন বর্ণহিন্দু। তাঁদের হাতে গড়ে ওঠা সংবাদ-সাময়িকপত্রের মাধ্যমেই গবেষকগণ উনিশ শতকের কোলকাতা কেন্দ্রিক হিন্দু-বাংলার রেনেসাঁ বা নব জাগরণকে চিহ্নিত করেছেন। উনিশ শতকের সংবাদ সাময়িকীর পরিচয় উল্লেখ প্রসঙ্গে মুনতাসির মামুন লিখেছেনঃ "ঐতিহ্য আবিষ্কার করতে গিয়ে হিন্দুরা প্রাচীনকালের ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে তুলেছিলেন এবং ঔপনিবেশিক শাসনে যে তারাই প্রাধান্য বিস্তার করে আছেন এ কথা বলতে তারা ভুলেন নি। বিশেষ করে উনিশ শতকের শেষ তিন দশকের হিন্দু পরিচালিত পত্র-পত্রিকাগুলি, যেমন "ঢাকা প্রকাশ", "হিন্দু রঞ্জিকা" প্রভৃতিতে এ মনোভাবই ব্যক্ত হয়েছিল ঘুরে ফিরে, আক্রমণাত্মক এবং উদ্ধতভাবে। মধ্যযুগে ভারত আগত মুসলমানদের তারা চিহ্নিত করেছিলেন আক্রমণকারীরূপে। কিন্তু ইংরেজরাও যে আক্রমণকারী এবং শাসক ও লুটেরা সে সব কথা তারা ভুলে গিয়েছিলেন। বঙ্কীমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র বা ভূদেব এদের সব রচনাতেই নিজেদের স্বতন্ত্র ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব করা হয়েছে।" (মুনতাসির মামুন: উনিশ শতকের বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫)

মুসলিম জাগরণের পূর্বাভাস:

শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রের অধিকারসহ সকল দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজ প্রতিবেশীদের সাংস্কৃতিক হামলার মুকাবিলা করার যোগ্যতা হারিয়েছিল। হারিয়েছিল হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের সচেতন প্রয়াসে জাগ্রত হবার সামর্থ। এই অবস্থায় মুসলমান সমাজের শহুরে অভিজাত স্তর থেকে এ সময় একটি নতুন নেতৃত্বের উদ্ভব ঘটলো। সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-৯৮), নওয়াব আবদুল লতীফ (১৮২৮-৯৩) ও সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮) ছিলেন এই ধারার নায়ক। এই নবধারার আন্দোলনের সাথে পরোক্ষ সমন্বয় ঘটিয়ে ১৯৬৭ সালে মওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী (মৃত্যু ১৮৭৩) জিহাদ আন্দোলনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। তিনি সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর (১৭৭৬-১৮৩১) বিপ্লবী ভাবধারা থেকে সরে দাঁড়িয়ে "ভিতর থেকে সংস্কার"-এর নতুন কর্মসূচী ঘোষণা করেন। তাঁর পরিচালিত তাইয়ুনী আন্দোলন "সনাতনী ধারা" নামে ঐতিহাসিকদের বিবেচনা লাভ করেছে।

হাজী মুহাম্মদ মুহসিনের (১৭৩২-১৮১২) দান করা যে বিশাল তহবিল ইংরেজরা ১৮১৬ সালে আত্মসাৎ করেছিল, নওয়াব আবদুল লতীফের চেষ্টায় ১৮৭৩ সালের ২৯শে জুলাই থেকে তা পুনরায় মুসলমানদের শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করা হয়। ঢাকা, হুগলী ও চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে আসা আলেমগণ এ সময় বাংলার প্রত্যন্ত এলাকায় মুসলিম গণ-জাগরণের লক্ষ্যে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে থাকেন। তাদের সাথে যুক্ত হন অবস্থাপন্ন মুসলিম পরিবারের ইংরেজী শিক্ষিত সন্তানগণ।

> এই সময় বাংলার জাগরণকামী মুসলমানদের মধ্যে নানা ধরণের সংগঠন কায়েম, সংবাদ-সাময়িকপত্র ও সাহিত্য ক্ষেত্রে এগিয়ে আসার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। ১৮৬৩ সালের ২০ এপ্রিল নওয়াব আবদুল লতীফের (১৮২৮-৯৩) উদ্যোগে কায়েম হয় মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি। ১৮৭৫ সালে কোলকাতা মাদ্রাসার ছাত্ররা গড়ে তোলেন "মাদ্রাসা লিটারারী এন্ড ডিবেটিং ক্লাব"। ১৮৭৮ সালের ১২ মে সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮) ও সৈয়দ আমীর হোসেনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতীয় মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন "ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন"। ১৮৭৯ সালে ঢাকা মাদ্রাসার সুপারিন্টেন্ডেন্ট ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী সোহরাওয়ার্দী কায়েম করেন "সমাজ সম্মিলনী সভা"। হিন্দু সমাজের বহু সংখ্যক পত্রিকার ভিড়ে ১৮৭৩ সাল থেকে ১৮৭৭ সালের মধ্যে "মোহাম্মদী আখবার" সহ চারটি মুসলিম সম্পাদিত সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশ পায়। বাংলার মুসলমানদের সাময়িকপত্র প্রকাশের সূচনা বলা চলে এ সময় থেকেই।

এই সময়কার আরো কিছু ঘটনা মুসলিম সমাজকে আত্মসচেতন হতে সাহায্য করে। ১৮৬৮ সালে ইংরেজ সিভিলিয়ান ডব্লিউ হান্টার-এর "এ্যানালস অব দি রুরাল বেঙ্গল" বা পল্লী বাংলার ইতিহাস এবং ১৮৭১ সালে তাঁর "দি ইন্ডিয়ান মুসলমান" প্রকাশিত হয়। এই বই দু"টিতে বাংলার মুসলমানদের অধঃপতিত দশার করুণচিত্র ফুটে ওঠে। ১৮৭২ ও ১৮৮১ সালের আদম শুমারী এবং

১৮৮২ সালের ভারতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাংলার মুসলমানদেরকে নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে সজাগ হতে উদ্বুদ্ধ করে। ১৮৮১ সালের আদম শুমারীতে স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, বর্ধমান প্রেসিডেন্সী, রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের জনসংখ্যার ৫০.১৬% মুসলমান এবং ৪৮.৪৫% হিন্দু। ১৮৮২ সালের ভারতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট থেকে স্পষ্ট হয় যে, বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী মুসলমানগণ প্রতিবেশি সমাজের হিন্দুদের তুলনায় শিক্ষায় পিছিয়ে পড়েছে। এমনি এক পটভূমি ও পরিস্থিতিতে জামাল উদ্দিন আফগানী কোলকাতা সফরের আগে থেকেই বাংলাদেশের জাগরণকামী সচেতন মুসলমানদের মাঝে তাঁর প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল।

আফগানীর কোলকাতা সফরের ফল:

রাম মোহন রায়ের কোলকাতা আগমনের (১৮১৭) পর প্রায় সাড়ে ছয় দশক পাড়ি দিয়ে কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু উত্থান যখন চূড়াস্পর্শী সে অবস্থায় জামাল উদ্দিন আফগানী ১৮৮২ সালে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানীতে আসেন। মুসলিম জাগরণের এই নকিবকে নিজেদের মাঝে পেয়ে বাংলার সমসাময়িক জাগরণকামী মুসলিম চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী, আলেম ও তরুণ সমাজ গভীর ভাবে আপ্লুত ও আলোড়িত হন। আফগানীর আহবান ও চিন্তাধারা দ্রুত দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। ইংরেজদের প্রতি আপোষকামী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও তাঁর অনুসারীদের উপদেশ ও বাধা অগ্রাহ্য করে বাংলার মুক্তিকামী মুসলিম তরুণেরা আফগানীর বিপ্লবী ভাবধারাকে স্বাগত জানান। জামাল উদ্দিন আফগানীর প্যান ইসলামী আদর্শ বাংলার সনাতনপন্থীদের সাথে জিহাদপন্থী ও ফরায়েজীদের সমঝোতার ক্ষেত্র রচনায়ও সাহায্য করে।

সৈয়দ আমীর আলীর (১৮৪৯-১৯২৮) উদ্যোগে কোলকাতার আলবার্ট হলে (বর্তমান কলেজ স্ট্রীটের কফি হাউজ) আফগানী "শিক্ষা ও শিক্ষা পদ্ধতি" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এই ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে তৎকালীন বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী, আলেম ও তরুণ সমাজ তাঁর কাছ থেকে আগামী দিনের মুক্তির মঞ্জিল সম্পর্কেও সুস্পষ্ট নির্দেশনা লাভ করেন। ফলে শিক্ষা, সাহিত্য, সাংবাদিকতা ও সাংগঠনিক তৎপরতার ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক জাগরণ সৃষ্টি হয়।

কোলকাতা থেকে আফগানিস্তান ও লন্ডন হয়ে ১৮৮৪ সালের মার্চ মাসে আফগানী প্যারিসে ফিরে যান। মিসরের মোহাম্মদ আবদুহু সেখানে তাঁর সাথে মিলিত হন। তাঁরা যৌথ ভাবে প্যারিস থেকে "আল উরওয়াতুল উসকা" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। কিছু সংখ্যক ভারতীয় মুসলমান এই পত্রিকা প্রকাশে আর্থিক সহযোগিতা করেন। এই পত্রিকা ভারত ও মিসরসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করে। পত্রিকাটি বিশ্বের দেশে দেশে জনগণকে ইসলামের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সাম্রাজ্যবাদের শৃংখল ভাঙ্গার প্রত্যক্ষ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার উদাত্ত আহবান জানায়। অতি অল্প সময়ে এই পত্রিকা এশিয়া ও আফ্রিকার স্বাধীনতাকামী মানুষের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরে পরিণত হয়। ইংরেজরা এ পত্রিকার প্রভাব উপলব্ধি করে মিসর ও ভারতবর্ষে এর প্রবেশ নিষিদ্ধ করে। কিন্তু নিষিদ্ধ ঘোষিত এই পত্রিকা বন্ধ লেফাফায় ডাকযোগে ভারতে আনা হতো। এ ছাড়া কোলকাতা থেকে প্রকাশিত "দার আল সুলতান" এবং এবং লাখনৌ থেকে প্রকাশিত "মুশির-ই-কায়সার" পত্রিকায় আফগানীর লেখাগুলি তরজমা করে প্রকাশ করা হতো। ফলে আফগানীর চিন্তাধারার সাথে এ এলাকার জনগণের একটি যোগসূত্র কায়েম হয়।

নানা বাধা-প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে "আল উরওয়াতুল উসকা" আট মাসে আঠারোটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। স্বল্প স্থায়ী এই পত্রিকা বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে স্বাধীনতাকামী মুসলমানদেরকে সংবাদ সাময়িকপত্র প্রকাশে বিপুলভাবে উদ্বুদ্ধ করে। জামাল উদ্দীন আফগানীর কোলকাতা সফর এবং তাঁর মতবাদের প্রভাবে উনিশ শতকের শেষের দিকে বাংলার জাগরণকামী মুসলমান সম্পাদিত সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশের সূচনা হয়। এর আগে শেখ আলীমুল্লাহ সম্পাদিত "সমাচার সভারাজেন্দ্র" (১৮৩১), রজব আলী সম্পাদিত "জগদুদ্দীপক ভাস্কর" (১৮৪৬) কিংবা সৈয়দ আবদুর রহিম সম্পাদিত "বালারঞ্জিকা" (১৮৭৩) মীর মোশারফ হোসেন সম্পাদিত "আজিজন নেহার" (১৮৭৪) ও আনিসউদ্দীন আহাম্মদ সম্পাদিত "পারিলবার্ত্তাবহ" (১৮৭৪) ইত্যাদি কয়েকটি সংবাদ সাময়িক পত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। এসব পত্রিকা বাঙ্গালি মুসলমান সমাজের জাগরণের ব্যাপারে দায়িত্ব পালনে সচেতন ও সক্রিয় ছিল বলে প্রমাণ মিলে।

সূত্রঃ দি পাইওনিয়ার প্রকাশিত "জামাল উদ্দীন আফগানী: নবপ্রভাতের সূর্যপুরুষ" গ্রন্থ

দ্বিতীয় পর্বঃ বাংলার মুসলিম জাগরণে জামাল উদ্দীন আফগানীর প্রভাব

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান